সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

সওম হচ্ছে সংযম– দিনে উপবাস থাকবো সে জন্য রাতে দিন দুয়েকের খাবার সাবাড় করে দিলাম – এর নাম সওম নয়।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

আষাঢ় ১৪২৩, জুন ২০১৬, রমজান ১৪৩৭

রমজান মাস ও আমাদের করণীয়

মাওলানা আবুল কালাম মাসুমী

পবিত্র রমজান মাস আরবি মাসসমূহের সরদার। বাবা হুজুর সাইয়্যেদ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.) বলেছেন– রমজান নামকরণ করার আগে এ মাসের নাম ছিল নাতিক। নাতিক মানে ধূলিসাৎ করে দেয়া। অন্যদিকে রমজ মানে পুড়িয়ে দেয়া, জ্বালিয়ে দেয়া। আরবি ভাষায় রোজাকে সাওম বলে। সাওম শব্দের অর্থ পরিহার করা, নিবৃত্ত থাকা। আমাদের দেশে আরবি সাওম শব্দটির বদলে রোজা শব্দটির ব্যাপক প্রচলন হয়েছে, রোজা ফার্সি শব্দ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও কামাচার থেকে নিবৃত্ত থাকাকে সাওম বা রোজা বলে। হিজরি দ্বিতীয় সনে রমজান মাসের রোজা ফরজ হয়। রোজা পালন মুসলমানের প্রতি আরোপিত অভূতপূর্ব কোনো বিধান নয়। ইহুদি-খ্রিস্টানসহ পূর্ববর্তী সব ধর্মাবলম্বীর প্রতিই রোজা পালনের নির্দেশ ছিল। সেহেতু প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা কোনো না কোনোভাবে রোজা পালন করে থাকেন। এমনকি পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও উপবাস পালনের রেওয়াজ দেখা যায়।

আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন : হে মুমিনরা! তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি। যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারো। [সুরা বাকারা, আয়াত নং-১৮৩]।

পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর রোজা ফরজ ছিল। আমাদের ওপরও ফরজ করা হয়েছে। যাতে করে আমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারি।

তাকওয়া শব্দটি কুরআনে বহু জায়গায় এসেছে। এ ব্যাপারে হযরত সাইয়্যেদ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.) বলেছেন– সাধারণভাবে বলা যেতে পারে তাকওয়া মানে সাবধানতা অবলম্বন, তাকওয়া মানে ভয়, এক অর্থে তাকওয়া মানে ভালোবাসাও বলা যায়। এখানে ভয় বলতে নিছক ভয়ের কথা বলা হচ্ছে না। যে ভয়ের কথা বলা হচ্ছে, সে ভয়ের সঙ্গে ভালোবাসা মিশে আছে।

অন্যদিকে তাকওয়া কথাটা যখন শয়তানের প্রসঙ্গে আসে, তখন তার অর্থ হয় সাবধান হওয়া, সতর্ক হওয়া। সমস্ত মনপ্রাণ, আমল-আখলাক দিয়ে ইমানকে বাঁচিয়ে রাখার নামই তাকওয়া।

যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, মিহি রেশমের কাপড় পরে গোলাপ বাগানের মধ্য দিয়ে অসাবধানে হাঁটলে মূল্যবান বস্ত্র কাঁটায় লেগে নষ্ট হবে, সুতরাং ঘন গোলাপ গাছের ফাঁকে হাঁটার সময় অবশ্যই প্রাণান্ত চেষ্টায় কাঁটার আঘাত থেকে বাঁচতে হবে– এরই নাম তাকওয়া। [কোরআন, হাদিস ও সূফীতত্ত্বের ভূমিকা]।

রমজান সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন : রমজান মাস এমন একটি পবিত্র মাস, যে মাসে মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারিম নাযিল করা হয়েছে। এ মাসের যে রাতে কুরআনুল কারিম নাযিল হয়েছে, সে রাতকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন : কৃদরের রাতের এবাদত হাজার মাসের এবাদতের চেয়েও উত্তম। রমজান মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহতায়ালা এ মাসটিকে স্বীয় ওহি এবং আসমানি কিতাব নাযিল করার জন্য মনোনীত করেছেন। রাসুলে করিম (সা.) এরশাদ করেন : হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর ওপর রমজানের ১ তারিখে সহিফা, ৬ তারিখে মুসা (আ.)-এর ওপর তাওরাত, ১৩ তারিখে ঈসা (আ.)-এর ওপর ইঞ্জিল, ৩ তারিখে দাউদ (আ.)-এর ওপর যবুর নাযিল হয়েছে। (নাযিলকৃত তারিখের ব্যাপারে মতভেদ আছে)।

রমজানের ফজিলত অপরিসীম। রমজান মাস কুরআনের মাস। রমজান মাসের অন্যতম করণীয় কাজ– কুরআনুল কারিম তেলাওয়াত করা, এটা আল্লাহর প্রত্যক্ষ কালাম; বুঝি বা না বুঝি কুরআন তেলাওয়াত অপরিসীম সওয়াব। মুসলমানদের জ্ঞানের শুরু ও শেষ হলো আল কুরআন। ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে এ ধরার রূপ, রস, গন্ধ পাওয়ার আগে নয়ন মেলে সৌন্দর্য দেখার পূর্বেই মানব শিশু শুনবে 'আল্লাহু আকবর'। আর এ সুন্দর ভুবন থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তেও তার কানে পৌঁছতে হবে আল কুরআনের অমিয় বাণী। বাবা হুজুর হযরত সাইয়্যেদ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.) বলতেন– 'নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করবে, আটকে আটকে গেলেও তেলাওয়াতে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। যদি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারছো না বা তেলাওয়াত শিখতে পারোনি– তবে শিখতে চেষ্টা করবে। না পারলে কুরআনের লাইনে লাইনে দেখে দেখে মুহব্বতে বিগলিত হয়ে হাত বুলাবে। দেখবে কুরআন তোমাকে মুর্শিদ হয়ে ইমানের পথে পরিচালিত করবে।'

এই রমজান মাসে কুরআনের তেলাওয়াত ও অনুশাসন মেনে প্রত্যেকটি আমল এখলাসের সঙ্গে আদায় করে রমজানকে নিজের জীবনে আত্মশুদ্ধির প্রধান সোপান মনে করতে হবে।

হুজুর পাক (সা.) এরশাদ করেন : মানুষের প্রত্যেক আমলের সওয়াব দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন : রোজা এ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা তা বিশেষভাবে আমার জন্য, তাই আমি স্বয়ং তার প্রতিদান দেবো। বান্দা তার কামভাব ও পানাহারকে আমার সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করেছে। হুজুর (সা.) বলেন : রোজাদারদের জন্য দুটি খুশি রয়েছে। একটি ইফতারের মুহূর্তে, আর দ্বিতীয়টি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ পাকের কাছে মিশকের সুগন্ধি থেকে উত্তম এবং রোজা ঢাল স্বরূপ (যা গুনাহ ও দোজখ থেকে বাঁচায়)।

রোজাদার খারাপ কথা বলবে না, শোরগোল করবে না, কেউ যদি রোজাদারকে গালাগাল করে অথবা ঝগড়া করতে আসে, তাহলে সে বলে দেবে– আমি রোজাদার (তুমি ঝগড়া করতে চাইলেও আমি ঝগড়া করবো না)। [বুখারি ও মুসলিম শরিফ]

রমজানের প্রথম মুহূর্ত থেকেই শয়তানকে শেকল দিয়ে বাঁধা হয়। দোজখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। বেহেশতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকে– হে নেকি অন্বেষণকারী অগ্রসর হও, হে বদি অন্বেষণকারী থেমে যাও। [তিরমিজি শরিফ]

হুজুর (সা.) এরশাদ করেন : যে ব্যক্তি রোজা রেখে খারাপ কথা, খারাপ কাজ ত্যাগ না করে তার পানাহার ত্যাগের কোনো প্রয়োজন আল্লাহর কাছে নেই। [বুখারি শরিফ]

রাসুল (সা.) বলেন : ইফতারের সময় রোজাদারের দোয়া কবুল হয়। তাই আমাদের উচিত ইফতারের সময় শোরগোল না করে পরিবারের বা অনুষ্ঠানের সবাইকে নিয়ে কায়মনে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। ইফতার তাড়াতাড়ি করা সুন্নত। সূর্যাস্তের পর পরই ইফতার করবে। হুজুর (সা.) বলেন : আমার উম্মত যতদিন পর্যন্ত তাড়াতাড়ি ইফতার করবে আর দেরিতে সাহরি খাবে, ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে।

সাহরি খাওয়া সুন্নত। হুজুর পাক (সা.) বলেন– ইহুদি-খ্রিস্টান ও আমাদের রোজার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরি খাওয়া। (এরপর পৃষ্ঠা ২)

(১ম পৃষ্ঠার পর)
তারা সাহরি খায় না। আমরা সাহরি খাই। তিনি আরো বলেন– সাহরি খাওয়া রোজাদারের ওপর আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা রহমত নাযিল করেন। হুজুরে পাক (সা.) বলেন– সাহরি খাও, নিশ্চয় সাহরি খাওয়ার মধ্যে বরকত আছে। যতি ক্ষুধা না থাকে তবুও সুন্নত আদায়ের জন্য অল্প হলেও খাবে, অন্তত এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরি করে নেবে। সাহরি শেষ সময় খাওয়া উত্তম (সুবহে সাদেকের পূর্ব মুহূর্তে)। সাহরি এত বেশি খাবে না যাতে করে সারা দিন অস্বস্তিকর অবস্থায় কাটাতে হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমরা অনেকের মুখে শুনে থাকি 'সেহরি'। অনেক বিদ্বানও সেহরি শব্দটি বলে থাকেন। অনেক প্রতিষ্ঠানের ক্যালেন্ডারে সেহরি লিখে থাকে, এটা সম্পূর্ণ ভুল। আমার জানা মতে বাংলাদেশে সর্ব প্রথম সাইয়্যেদ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.) এই শব্দটি সংশোধন করে বলেন– সেহের শব্দের অর্থ জাদু। এবং সাহরি অর্থ রোজার উদ্দেশ্যে শেষ রাতের খানা। এর পর থেকেই অনেক প্রতিষ্ঠান বা বিদ্বান ব্যক্তি সাহরি বলতে বা লিখতে শুরু করেন।

রমজান মাসে তারাবি নামাজ পড়া ইসলামি শরিয়তে সুন্নাতে মোয়াককাদা। এতে যেমন কারো দ্বিমত নেই, তদ্রূপ তারাবির নামাজ বিশ রাকাত হওয়ার ব্যাপারেও সবাই একমত। রাসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের আমল এটাই প্রমাণ করে যে, তারাবির নামাজ বিশ রাকাত সুন্নাতে মোয়াককাদা। সাহাবায়ে কেরাম হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে বিশ রাকাত তারাবি ও তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন। এ জন্যই ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-সহ অন্য প্রায় সকল মুজতাহিদ ইমাম তারাবির নামাজ বিশ রাকাত হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

তারাবির নামাজ বিশ রাকাত সুন্নত হওয়া, এটা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আর ইজমা তথা উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত– এটাও শরিয়তের বড় দলিল। মোল্লা আলী কারী বলেন– সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে তারাবি বিশ রাকাত। [মিরকাত]

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় পার্থিব কাজকর্ম এবং পরিবার-পরিজন থেকে পৃথক হয়ে পুরুষ মসজিদে, নারীরা গৃহে নামাজের স্থানে অবস্থান করে। আল্লাহ পাকের রেজামন্দি হাসিলের উদ্দেশে এবাদত-বন্দেগিতে নিয়োজিত থাকাকে ইতেকাফ বলে। রমজান মাসের শেষ দশকে ইতেকাফ করা সুন্নাতে মোয়াককাদায়ে কেফায়া। মহল্লার কেউ যদি ইতেকাফ না করে, তাহলে সকলেই গোনাহগার হবে।

কৃদরের রাতে এবাদত করা কেবল হাজার মাসের এবাদতের সমানই নয় বরং তার চেয়েও বেশি। এই বিশেষ রাতটি রমজানের কোন রাত তা অবশ্য অনেকটা রহস্যাবৃত। কেননা হাদিস শরিফে এ রাতকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। রাসুল (সা.) রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কৃদর অন্বেষণের তাগাদা দিয়েছেন। লাইলাতুল কৃদরের ব্যাপারে বাবা হুজুর (রহ.) বলেছেন– আমার নানাজান হযরত শাহ কারামত আলী জৌনপুরি (রহ.) বলেছেন : রমজানের ২০ তারিখের পর বেজোড় রাতে শবেকৃদর খোঁজ করো। হযরত আলী (রা.) বলেছেন : আল্লাহতায়ালা শবেকৃদরকে লুকিয়ে রেখেছেন। হযরত ফাতেমা (রা.) জিদ ধরাতে হযরত আলী (রা.) বললেন : সুরা কৃদরে 'লাইলাতুল কৃদর' কথাটি তিনবার এসেছে। লাইলাতুল কৃদর কথাটিতে মোট নয়টি অক্ষর আছে। অতএব নয়কে তিন দিয়ে গুণ করলেই পেয়ে যাবে রহস্যের চাবি। সে অর্থে শবেকৃদর হয় রমজানের সাতাশের রাতে। [কোরআন, হাদিস ও সূফীতত্ত্বের ভূমিকা]

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, আমরা রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে কৃদর পেয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। সর্বশেষ হুজুর পাক (সা.)-এর একটি হাদিস উল্লেখ করেই শেষ করবো।

হযরত ওমর (রা.) হুজুর পাক (সা.)-এর কাছে রমজান শরিফের ফজিলত জানতে চাইলে হুজুর (সা.) চারটি আসমানি কিতাবে রমজানের চারটি পরিচয় তুলে বলেন : ১. তাওরাত কিতাবে রমজানকে হাত্ব নামে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ– গুনাহকে ধ্বংস করা। ২. যবুর কিতাবে রমজানকে 'কোরবত' নামে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ– রমজান মাসে বান্দা আমলের মাধ্যমে আল্লাহর অধিকতর কোরবত বা নৈকট্য হাসিল করে। ৩. ইঞ্জিল কিতাবে রমজানকে ত্বাব নামে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ– রমজান মাসে বান্দা পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে পবিত্র হয়ে যায়। ৪. আল কুরআনে এ মাসকে রমজান নামে উল্লেখ করেছেন। এর তাৎপর্য– রমজান মানুষের কু-রিপুসমূহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। অথবা হেমন্তকালীন বৃষ্টিপাত যেমন দুনিয়ার বৃক্ষ-লতাকে সজীব করে তোলে, তেমনভাবে রমজানের আগমনেও বান্দারা সকল বিষয়ে আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য ও সার্থক হয়ে আল্লাহর বন্ধু হয়ে যায়।

আল্লাহ আমাদের সকলকে রমজানের পরিপূর্ণ হক আদায় করে খাঁটি মুমিন হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

লেখক : খতিব/ইমাম : বাইতুর রহিম মসজিদ কমপ্লেক্স
পূর্ব মনিপুর (নুরানিপাড়া), মিরপুর, ঢাকা।

বরং দিন দিন ভোগের চাহিদা বাড়তেই থাকে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যদি কোনো আদম সন্তান সম্পদে পরিপূর্ণ একটি পাহাড়ের মালিক হয়ে যায়, তাহলে সে দ্বিতীয়টি আকাঙ্ক্ষা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই ভরবে না। (মুসনাদে আহমাদ : ১২২২৮, মুসনাদে আবু দাউদ : ৫৪১, জামেয়ে মায়মার : ১৯৬২৩, মুসনাদে ইসহাক : ৪০৩, সুনানে দারেমি : ২৮২০)। অপরদিকে ত্যাগ মানব জীবনকে সর্বাবস্থায় মহিমান্বিত করে। কারণ ত্যাগী মানুষের জীবনে কোনো শূন্যতা, কোনো হাহাকার থাকে না। তারা নিজেকে মানব কল্যাণে বিলিয়ে দেয়াতে শান্তি পায়। সুতরাং তারা যত হারায় ততই পরিতৃপ্ত হয়। মাহে রমজান ত্যাগের মহিমাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তাই তো মহানবী (সা.) মাহে রমজান এলে অকাতরে দান করে যেতেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) মানুষের মধ্যে সব থেকে বেশি সম্পদ উৎসর্গকারী ছিলেন। বিশেষ করে রমজান মাস এলে জিবরাইল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতো আর এ সময়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সম্পদ উৎসর্গের মাত্রা বৃষ্টি আনয়নকারী বায়ু অপেক্ষা বেশি গতিসম্পন্ন হয়ে উঠতো। (সহিহ আল-বুখারি : ১৯০২, সহিহ মুসলিম : ২৩০৮, মুসনাদে আহমাদ : ২৬১৬ , আল আদাবুল মুফরাদ : ২৯২)।

সমগ্র পৃথিবী ও এর যাবতীয় সম্পদ মহান আল্লাহর সৃষ্টি। আসমান ও জমিন ও এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবের নিরঙ্কুশ মালিক মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ। আল্লাহ মানুষকে শুধু জীবনের প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহারের মালিকানা প্রদান করেছেন। তাই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের ওপর সকল মানুষের অধিকার সমান। কিন্তু অবস্থা ভেদে ও যোগ্যতার ব্যবধানে কেউ বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক আবার কেউ বা কপর্দকহীন। কেউ আকাশসম অট্টালিকার আয়েশি জীবনে খোদার নেয়ামতের অপচয় করে চলেছে। আবার কেউ-বা জীর্ণ কুটিরে অনাহারে অর্ধাহারে নিতান্ত যাতনার মধ্যদিয়ে দিন পার করছে। বিশাল এই পৃথিবীর মহান স্রষ্টা মানব সমাজের এই ঘৃণ্য বৈষম্যকে মেনে নিতে পারেননি। তাই মহান আল্লাহ রমজান মাসের রোজাকে ফরজ করেছেন। যাতে মানুষ মানুষের জীবন যন্ত্রণার বাস্তব উপলব্ধি অর্জন করতে পারে এবং যন্ত্রণা লাঘবে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে। আর রাসুলুল্লাহ (সা.) রোজাদারকে ইফতার করানোর জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। ত্রিশ দিনের রোজা পালনরত অভুক্তকে খাদ্য দান করার (ইফতার করানোর) ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেছেন : এর দ্বারা মহান আল্লাহ তাঁর জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব তাকে দান করবেন, অথচ রোজাদরের সওয়াব বিন্দুমাত্র কম করা হবে না। আলোচ্য হাদিসের মাধ্যমে আসলে রাসুলে কারিম (সা.) সমাজের দিনহীন, অভুক্ত-অনাহারী অসহায় মানুষের সাহায্যের প্রতি উম্মতের ধনিক শ্রেণির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মাহে রমজানের সিয়াম সাধনা নিছক উপবাস চর্চা না হয়ে আমাদের সকলের জীবনে হয়ে উঠুক নৈতিক ও আদর্শিক উত্তরণের মাইলফলক আর আমাদের সমাজটা আদর্শিক মানদণ্ডে স্থাপিত শান্তিপূর্ণ আদল ফিরে পাক! আমিন।

লেখক : পেশ ইমাম ও খতিব
রাজশাহী কলেজ কেন্দ্রীয় মসজিদ, রাজশাহী

বলেছেন : বহু রোজাদার এমন আছে, যারা তাদের রোজার বিনিময়ে ক্ষুধা আর তৃষ্ণার কষ্ট ছাড়া অন্য কিছুই পায় না। (মুসনাদে আহমাদ : ৯৬৮৫, সুনানে দারেমি : ২৭৬২ , আস্-সুনানুল কুবরা : ৩২৩৬ , সুনানে ইবনে মাযা : ১৬৯০)। বস্তত, রোজা রেখে বাহ্যিকভাবে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার বর্জন করে সিয়াম সাধনার আসল উদ্দেশ্য আদর্শিক ও নৈতিক শিক্ষা অর্জন করতে না পারলে সে রোজা হবে রোজাদারের ক্ষুধা আর পিপাসার কষ্টের মধ্য দিয়ে নিষ্ফল উপবাস-চর্চা। তাই আমাদের উচিত সিয়াম সাধনায় মৌলিক শিক্ষার বিষয়গুলো খুঁজে বের করা।

আত্মশুদ্ধি : আত্মশুদ্ধি একজন মুমিনের জীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আত্মা পরিশুদ্ধ না হলে বাহ্যিক আচরণ ও আমল কোনোটাই শুদ্ধ হতে পারে না। আর ইসলাম যত বিধান নিয়ে এসেছে সবগুলোরই আসল উদ্দেশ্য আত্মার বিশুদ্ধতা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর যাবতীয় ক্লেশ-সাধনার মূলেও ছিল ওই একই উদ্দেশ্য। কারণ পবিত্র কুরআনে খোদার প্রেমকে সাফল্যের আসল সামান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, 'হে নবী আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। তা করলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন, তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন। আর আল্লাহ হলেন পরম ক্ষমাশীল ও অসীম করুণাময়।' (সুরা আলে ইমরান : ৩১)। আর এই যে আল্লাহর ভালোবাসা– এটা একমাত্র আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। সে কারণে ইসলামে তাসাউফ বা সুফিবাদ নামে একটি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সুফিবাদের মূল কথাই হলো– প্রেম ও আত্মশুদ্ধি। আর প্রেমের বাহ্যিক নিদর্শন হলো– প্রেমাস্পদের জন্য নিজেকে বিলীন করে দেয়া। সুফিতত্ত্বের এই মূল দর্শন তথা ফানাফিল্লাহর প্রথম স্তর হচ্ছে আত্মশুদ্ধি। আর আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে মাহে রমজান ও সিয়ামের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। আসলে ভালোবাসা মনের এক সুকোমল বৃত্তির নাম হলেও এটা যে একতরফা হতে পারে না সেটা সর্বজনবিদিত একটি বিষয়। মানুষ যখন নিজের জীবনের সকল কামনা-বাসনাকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশে নিবেদন করবে, ঠিক তখনই মহান আল্লাহর ভালোবাসায় সে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। আর সে জন্যই তাসাউফের সাধকরা নিজেদের শিষ্য বা সাগরিদদের বেশি-বেশি রোজা রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। মানুষ নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশে নিবেদনের সবচেয়ে বড় উপায় হলো– সিয়াম সাধনা। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মুমিন বান্দা মহান আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে। এরশাদ হয়েছে, 'হে নবী! যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তখন তুমি বলে দেবে যে, আমি তাদের খুবই কাছেই রয়েছি। কোনো আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে, আমি সাথে সাথেই তার আহ্বানে সাড়া দিই। সুতরাং তাদের উচিত আমার নির্দেশ মেনে চলা এবং আমার ওপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস রাখা। আর কেবল তাহলেই তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।' (সুরা আল-বাক্বারা : ১৮৬)।

তাকওয়া : তাকওয়া আরবি শব্দটির আভিধানিক অর্থ ভয় করা। আর ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় তাকওয়া বলতে মানব মনের এমন এক শক্তিকে বোঝায় যা মুমিন ব্যক্তিকে সর্বদা অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সে সদাসর্বদা এই ভয়ে ভীত থাকে যে জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো কাজেও যদি আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হয় তা হলেও কিয়ামতের দিন সেজন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই মুমিন ব্যক্তি সব সময় নিজের আত্মার বাধ্যবাধকতায় নিজ জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড খোদায়ি বিধানের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। অতএব বলা যায়, তাকওয়ার অর্থ হলো জীবনকে আত্মনিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। অন্যভাবে বললে, মুমিনের আচরণ নিয়ন্ত্রণে আইন, প্রশাসন বা সামাজিক দণ্ডের কোনো প্রয়োজন হয় না– সে হয় আত্মনিয়ন্ত্রিত। এই তাকওয়াই হলো রোজার প্রধান শিক্ষা। একজন রোজাদার যদি লোকচক্ষুর আড়ালে খায় বা পান করে অথবা যৌনকর্মে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে কেউই বাধা দিতে পারে না। কিন্তু সে শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে তা করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে দীর্ঘ একমাস মহান আল্লাহর নির্বাহী আদেশে দিনের বেলায় হালাল খাদ্য, পানীয় ও বৈধ বিবাহিত স্ত্রীর একান্ত সান্নিধ্য বর্জন করার মাধ্যমে প্রত্যেক মুমিন তার জীবনে সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার স্থায়ী অভ্যাস গড়ে তুলবে অর্থাৎ তাকওয়া অর্জন করবে এটাই রোজার প্রধান শিক্ষা। এরশাদ হয়েছে, 'হে ইমানদাররা! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সুরা আল-বাক্বারা : ১৮৩)।

সহমর্মিতা : সামাজিক সুশাসন, সাম্য ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য সহমর্মিতা একটি অপরিহার্য বিষয়। কারণ মানুষ সামাজিক জীব। আর জীবনের রয়েছে সীমাহীন প্রয়োজন। জীবনের প্রয়োজন পূরণে পৃথিবীর কোনো মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই নিজের প্রয়োজনে মানুষকে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়। আবার অন্যের প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে দিতে হয়। প্রয়োজন মানুষকে তাড়িত করে দিক থেকে দিগন্তে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মানুষ ছুটে বেড়ায় শুধুমাত্র জীবনের প্রয়োজনে। তাকে সম্মুখীন হতে হয় অসংখ্য প্রতিকূলতার। প্রতিকূল পথযাত্রায় জীবনের পরিপূর্ণতায় পারস্পরিক সহমর্মিতা সব থেকে বড় বিষয়। কারো সুখের সাথী হওয়া, বেদনার ভাগী হওয়া, অনাহারক্লিষ্টকে আহার জোগানো, পীড়িতের সেবা করা, অসহায়কে আশ্রয় দেয়া অত্যন্ত মহৎ কাজ। মহানবী (সা.) এরশাদ করেছেন : যে মুসলমান কোনো বস্ত্রহীন মুসলমানকে বস্ত্র দান করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরাবেন। আর যে মুসলমান কোনো ক্ষুধার্ত মুসলমানকে খাবার খাওয়াবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফলমূল দিয়ে আহার করাবেন। যে মুসলমান কোনো তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের মোহরাঙ্কিত সুগন্ধিযুক্ত শরবত পান করাবেন। (মুসান্নেফে ইবনে আবি শাইবা : ৩৪৩৫৫ , মুসনাদে আহমাদ : ১১১০২, সুনানে আবু দাউদ : ১৬৮২, জামে তিরমিযি : ২৪৪৯, শুআবুল ইমান : ৩০৯৮)। পারস্পরিক সহমর্মিতা রমজান মাসের রোজার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। মহানবী (সা.) এরশাদ করেছেন : 'অ-হুয়া শাহ্‌রুল মুওয়াসাতি' অর্থাৎ রমজান হলো পারস্পরিক সহমর্মিতার মাস। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি এ মাসে তার অধীনস্তদের কাজের বোঝা কমিয়ে দেবে, মহান আল্লাহ তার সমস্ত সগিরা গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তাকে জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি দান করবেন। (সহিহ ইবনে খুযাইমা : ১৮৮৭, আদ্-দাওআতুল কাবির : ৫৩২, শআবুল ইমান : ৩৩৩৬)। রমজান মাসের ত্রিশ দিন রোজা পালনের মাধ্যমে সমাজের বিত্তবান মুসলমানরা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুধার জ্বালার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাদের প্রতি সহমর্মী হয়ে উঠবে এটা রোজার বিধান আরোপে মহান আল্লাহর অন্যতম ইচ্ছা।

ধৈর্য : জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় এবং সমাজে শৃঙ্খলা বিধানে ধৈর্য সব থেকে বড় উপাদান। ধৈর্য ছাড়া জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ ধৈর্য বা সবর সম্পর্কে সুরাতুল আসরের মধ্যে এরশাদ করেছেন, 'যুগের শপথ! নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু তারা নয় যারা ইমান এনেছে, সৎকাজ সম্পাদন করেছে এবং পরস্পর একে অন্যকে সত্য ও সবরের উপদেশ দেয়।' মুহাক্কিক আলিমদের মতে, সবরের বা ধৈর্যের স্তর তিনটি। (ক) এবাদত-বন্দেগি পালন করতে তথা আল্লাহর আদেশ পালন করতে শারীরিক ও মানসিক যে কষ্ট হয়, সে কষ্ট সহ্য করে নির্দ্বিধায় সেটা পালন করে যাওয়া। যেমন নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত যথানিয়মে পালন করতে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করা ধৈর্যের প্রথম স্তর। (খ) মহান আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা মান্য করার কষ্ট সহ্য করে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা। যেমন প্রচণ্ড অভাবের মধ্যে হারাম উপার্জনের সমূহ সুযোগ থাকার পরেও তা বর্জনের কষ্ট সহ্য করা, মারাত্মক যৌন উত্তেজনার সময়ে অবৈধ নারী গমনের নিরাপদ সুযোগ থাকার পরেও তা থেকে বিরত থাকার কষ্ট সহ্য করা ইত্যাদি। (গ) অসুখ-বিসুখ, বালা-মুসিবতের সময়ে বাহ্যিক কষ্ট ও মনো-যন্ত্রণা সহ্য করা এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত অসুখ বা বিপদকে নিজের জন্য কল্যাণকর বলে বিশ্বাস করা। এই সবর বা ধৈর্যের শিক্ষাটা সিয়াম সাধনার অন্যতম প্রধান শিক্ষা। আর সবরের বিনিময় হলো সরাসরি জান্নাত। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : হুয়া শাহরুস্ সাবরি ওয়াস্ সাবরু সাওয়াবুহুল জান্নাহ'– এটি সবরের মাস আর সবরের বিনিময় হলো জান্নাত। (সহিহ ইবনে খুযাইমা : ১৮৮৭, আদ্-দাওআতুল কাবির : ৫৩২ , শআবুল ইমান : ৩৩৩৬)। একজন রোজাদার প্রচণ্ড ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেও খাবারের সমূহ ব্যবস্থা থাকার এবং খাবার গ্রহণে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকার পরেও সে ধৈর্য ধারণ করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এভাবেই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মুমিন নিজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরিয়তের নির্ধারিত সীমা রক্ষায় ধৈর্য ধারণের অভ্যাস গড়ে তুলবে এটাই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য।

আত্মত্যাগ : ভোগের নেশা মানুষের জীবনকে শূন্যতা আর বেদনায় ভরে দেয়। কারণ ভোগের চাহিদা কোনো দিন পূর্ণ হয় না। **(এরপর পৃষ্ঠা ২)**

(৩ এর পৃষ্ঠার পর)

শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সিয়াম সাধনা

মোহাম্মদ মাকছুদ উল্লাহ

মাহে রমজানের সিয়ামের সাথে সাধনা কথাটা অপরিহার্য ভাবে মিশে আছে। সাধনা বলতে কাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু অর্জনে অব্যাহত প্রচেষ্টা, আরাধনা ও অধ্যাবসায়কে বোঝায়। বস্তুত মাহে রমজানের সিয়াম– অবক্ষয় কবলিত সমাজকে আদর্শিক মানদণ্ডে উত্তরণের এক অব্যাহত প্রচেষ্টা ও অনুশীলন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের দীর্ঘ দশ বছরের সাধনার পরেই মহান আল্লাহ শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের মৌলিক উপাদান ও প্রশিক্ষণ হিসেবে দান করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) পৃথিবীতে সর্বকালীন ইতিহাসের জঘন্যতম একটি সমাজে প্রেরিত হয়েছিলেন। সার্বিক অবক্ষয়ের তলানিতে অবনমিত সে সমাজকে ইতিহাস বর্বর আখ্যায় স্থায়িত্ব দান করেছে। সে বর্বর সমাজটিকে আদর্শ ও শান্তির ধারায় ফিরিয়ে আনতে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে চেষ্টা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশেষে মদিনায় হিজরত করে তিনি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য একটি ভিত খুঁজে পান। আর তখনই প্রথম হিজরি শাবান মাসের দশ তারিখে রমজান মাসের রোজা অপরিহার্য করে আয়াত নাযিল হয়েছিল, 'হে ইমানদাররা! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হলো, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপরে, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সুরা আল-বাক্বারা : ১৮৩)। আরো নাযিল হয়, 'রমজান হলো সে মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য হেদায়েত এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে অবশ্যই তাতে রোজা রাখবে। আর যে অসুস্থ হবে বা সফরে থাকবে সে অন্য সময়ে গুনে গুনে (ছেড়ে দেয়া রোজাগুলো) পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সহজ করে দিতে চান; তোমাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করতে চান না।' (সুরা আল-বাক্বারা : ১৮৫) উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে রমজান মাসে সিয়াম ফরজ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে (ক) তাকওয়া অর্জন করা (খ) হেদায়েত লাভ করা (গ) এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারা। তাকওয়া বলতে বোঝায়, মহান আল্লাহর ভয়ে সমস্ত প্রকার পাপের কাজ থেকে বিরত থাকাকে। আর হেদায়েত হলো, জীবনের সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ মহান আল্লাহর বিধিনিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলা। কোনো ভয়ে ভীত হয়ে বা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধিনিষেধ থেকে বিন্দু পরিমাণও বিচ্যুত না হওয়া। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সিয়াম সাধনায় শতভাগ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আর সে জন্যই তাদের পক্ষে সর্বকালীন ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

পূর্ব যুগে রোজার বিধান : সাওমুন শব্দটি আস্-সাওমু মূলধাতু থেকে নির্গত। 'আস্-সাওমু' আরবি শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় ও যৌনতা থেকে বিরত থাকার নাম সাওমুন বা রোজা। প্রথম হিজরিতে যখন রোজা ফরজ করা হয় তখন রোজা পালনের পদ্ধতি ছিল সাংঘাতিক কষ্টসাধ্য। তখন একজন রোজাদারের জন্য খাদ্য-পানীয় গ্রহণ ও স্ত্রী সম্ভোগের অনুমতি ছিল সূর্যাস্তের পর থেকে এশার নামাজ আদায়ের অথবা ঘুমিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত। অর্থাৎ কেউ এশার নামাজ আদায় করে নিলে অথবা ঘুমিয়ে পড়লে তখন থেকেই তার রোজা শুরু হয়ে যেতো, তাতে রাত যতটাই অবশিষ্ট থাকুক না কেন। ফলে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে লাগলেন। অতঃপর মহান আল্লাহ রোজার বিধান সহজ করে আয়াত নাযিল করেন, 'রোজার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সাথে সহবাস হালাল করা হলো। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্যে পরিচ্ছদ স্বরূপ। মহান আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারিত হয়ে পড়েছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দান করেছেন। অতএব তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু বিধিবদ্ধ করেছেন তা অন্বেষণ করো। আর পানাহার কর যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোজা পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত।' (সুরা আল-বাক্বারা : ১৮৭) ইসলাম-পূর্ব যুগে রোজার বিধান ছিল আরো কষ্টকর। তখন খাদ্য, পানীয় এবং যৌনতা বর্জনের সাথে সাথে পূর্ণ দিবস কথা বলাও বন্ধ রাখতে হতো। হজরত মারইয়াম (আ.)-এর রোজার বিবরণ দিয়ে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, 'আর যখন তুমি মানুষের মধ্য থেকে কাউকে দেখবে, তখন তুমি তাকে ইশারাতে বলে দেবে, আমি আজ দয়াময় আল্লাহর উদ্দেশে রোজার মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সাথে কথা বলতে পারবো না।' (সুরা মারইয়াম : ২৭)।

রোযার বিধান সহজ হলো যে ভাবে : হজরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : প্রথম যখন রোজা ফরজ হয় তখন কেউ রোজা রেখে সূর্যাস্তের পরে ঘুমিয়ে গেলে তখন থেকেই তার রোজা আরম্ভ হয়ে যেতো এবং তাকে পরবর্তী দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে হতো। এমতাবস্থায় সিরমাহ ইবনে কায়েস (রা.) একদিন রোজা রেখে সন্ধার পরে তার স্ত্রীর কাছে এসে বললেন, 'তোমার কাছে কি খাবার মতো কোনো কিছু আছে?' তিনি বললেন– 'না। তবে আমি যাচ্ছি, তোমার জন্য কিছু জোগাড় করে নিয়ে আসছি।' স্ত্রী বেরিয়ে গেলেন, এদিকে সিরমাহ ইবনে কায়েস (রা.) ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। স্ত্রী ফিরে এসে তাকে ঘুমন্ত দেখে বললেন, 'তোমাকে অভুক্তই থেকে যেতে হবে।' পরের দিন দুপুর হতে না হতে তিনি যখন ক্ষেতে কাজ করছিলেন, তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন। বিষয়টি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জানানো হলে রোজার বিধান সহজ করে আয়াত নাযিল হলো। (সুনানে আবু দাউদ : ২৩১৬ , সুনানে দারেমি : ১০৫৩, মুসনাদে আহমাদ : ১৮৬১২ , জামে তিরমিযি : ২৯৬৮, সহিহ ইবনে খুযাইমা : ১৯০৪, সহিহ ইবনে হিব্বান : ৩৪৬০) অপর এক বর্ণনায় হজরত ইকরিমাহ (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে– 'হে ইমানদাররা তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর' আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যামানায় প্রথম দিকে যখন মানুষ রোজা রাখতো, তখন কেউ সূর্যাস্তের পরে এশার নামাজ আদায় করে নিলে তার ওপর খাদ্য, পানীয় এবং স্ত্রী সম্ভোগ হারাম হয়ে যেতো। অতঃপর তাকে পরবর্তী দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা পূর্ণ করতে হতো। এমতবস্থায় এক ব্যক্তি (এক বর্ণনা মতে হজরত ওমর রা.) নিজের নাফসের ওপর খিয়াত করে বসলেন। তিনি এশার নামাজ আদায়ের পরে নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন অথচ তিনি তখন পর্যন্ত কোনো কিছু আহার করেননি। সুতরাং আল্লাহ তাআলা রোজার বিধান সহজ করার ইচ্ছা করে আয়াত (সুরা আল-বাক্বারা : ১৮৭) নাযিল করলেন। (সুনানে আবু দাউদ : ২৩১৫, আস-সুনানুল কুবরা : ৭৯০১ , তাফসিরে ত্বাবারি, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা : ৫০২)।

সিয়াম সাধনা যেভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে : মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক সত্তা বিকশিত হয়। ব্যক্তির আচরণের ওপর ভিত্তি করেই সামাজিক সম্পর্কের উন্নতি ও অবনতি সাধিত হয়। সে মতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা আর অশান্তির দায় সম্পূর্ণটাই মানুষের। মানুষ যখন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, ভোগের নেশায় আত্মমগ্ন হয়ে যায় তখন তার হিতাহিত জ্ঞান বলতে কিছুই থাকে না। তার মানবিক বোধ লোপ পেয়ে যায়। সে তখন নিজের সীমাহীন ভোগের চাহিদা মেটাতে অন্যের অধিকারকে দলিয়ে-মথিয়ে একাকার করে ফেলে। ফলে সমাজ দগ্ধ হতে থাকে নারকীয় যন্ত্রণায়। তাই মহান আল্লাহ চেয়েছেন– মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে, মানব মনের ভোগের নেশাকে মিটিয়ে দিয়ে ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত করতে। মুমিন বান্দা সমস্ত বৈষয়িক স্বার্থের বিপরীতে পরকালীন প্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে, নিজের সমস্ত কামনা-বাসনার উর্ধ্বে মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের সদিচ্ছাকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দান করবে এ উদ্দেশেই মহান আল্লাহ মাহে রমজানের রোজাকে ফরজ করেছেন। তাই রোজার বাহ্যিক অনুশীলনটা যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এর নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষার দিকটি। **(এরপর পৃষ্ঠা ৩)**

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ পাবলিকেশন্স ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৪৬/১ পূর্ব তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান: বাইতুর রহিম জামে মসজিদ ও আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১ পূর্ব মনিপুর, মিরপুর ঢাকা।